# দ্য কিলিং অব ওসামা

মূল:
**সিমর হার্শ**
অনুসন্ধানী সাংবাদিক

ভাষান্তর:
**সোহেলী তাহমিনা**

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
**www.projonmo.pub**

# দ্য কিলিং অব ওসামা

## সিমর হার্শ

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

**অনলাইন পরিবেশক**

| | | |
|---|---|---|
| Rokomari.com | AmaderBoi.com | islamiboi.net |
| Boibazar.com | Ruhamashop.com | Wafilife.com |
| Sukun.shop | Alfurqanshop.com | Sijdah.com |
| Shobdaloy.com | Islamicboighor.com | Boipark.com |
| Pothikshop.com | Niyamahshop.com | Kitabghor.com |
| Tariqzone.com | Boisomahar.com | Ittadishop.com |

**মূল্যঃ ২১৬ [দুইশত ষোল] টাকা**

The Killing Of Osama by Seymour M. Hersh, Translated by Soheli Tahmina, Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
Price: 216 Taka , 10 US$
ISBN: 978-984-34-6702-3

# লেখক পরিচিতি

সিমর হার্শ ১৯৩৭ সালের ৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জন্ম গ্রহণ করেন। 'নিউ ইয়র্কার' ও 'লণ্ডন রিভিউ অফ বুকস' এর জন্য লেখালেখির পাশাপাশি তিনি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' এর ওয়াশিংটন প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রায় চার দশক আগে ভিয়েতনামের 'মাই লেই' তে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত সত্য উদঘাটন ও প্রকাশনার মাধ্যমে তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জগতের একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর এই অবদানের জন্য তিনি পুলিৎজার পুরস্কারেও ভূষিত হন। সেই সময় থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার পিছনে কিসিন্‌জারের ভূমিকা এবং আবু গারিব জেলখানায় সেনাবাহিনীর অত্যাচারের নির্মম সত্যসহ বিভিন্ন ধরনের সত্য ঘটনা তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পাঁচ বার জর্জ পোল্ক পুরস্কার, দুইবার ন্যাশনাল ম্যাগাজিন অ্যাওয়ার্ড ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট, এলএ টাইমস্ বুশ পুরস্কার ও ন্যাশনাল বুশ ক্রিটিক সার্কেল পুরস্কার লাভ করেন।

# বই সম্পর্কে

২০১১ সালে ইউএস নেভী সীলস্ এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কিছু সৈনিক নিয়ে গঠিত একটি দল পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরের একটি বাড়িতে অতর্কিত হামলা করে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। ওসামাকে গ্রেফতার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৯/১১ এর ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্বক আক্রমণের আগে থেকেই তদন্ত করে যাচ্ছিল। এই হত্যার সংবাদ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা'র রাজনৈতিক জীবনে বেশ ভাল ফল বয়ে এনেছিল। এতে তাঁর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালের প্রথম পর্যায়ে যেমন সাফল্যের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি ঠিক তার পরের বছরেই অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু গোটা বিশ্বের সামনে সে রাতের ঘটনা যেভাবে তুলে ধরা হয়েছিল তার বেশিরভাগটাই ছিল অসম্পূর্ণ গল্প, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যা গল্পও তুলে ধরা হয়েছিল। বাস্তবে যা ঘটেছিল তার সকল প্রমাণ আজও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

একই সাথে, সিরিয়ার সংঘটিত 'সিভিল ওয়্যার' এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার ঘটনাও প্রবঞ্চনা ও কূটনৈতিকতার আড়ালে নিপুণভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটি একটি বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক কার্যনীতি যার কারণে সিরিয়াতে আইএসআইএস এবং এর পূর্ববর্তী অন্যান্য জঙ্গী সংগঠনগুলোর প্রতি তুরস্কের সমর্থন যোগানোর ঘটনাটিকে হোয়াইট হাউস নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করে গেছে।

'লণ্ডন রিভিউ অব বুকস্' এ একটি ধারাবাহিক হিসেবে শুরু হওয়া অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত এই তথ্যগুলো প্রকাশিত হলে গোটা বিশ্ব গণমাধ্যমজুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ওবামার পরবর্তী সময়ে তাঁর কার্যাবলীর কোন বিষয়টি তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য আদর্শ বা নিদর্শন হয়ে থাকবে, বইটির 'ভূমিকা' অংশে সেই উত্তরটিই খুঁজেছেন লেখক হার্শ। ওবামার শাসনামলে কি তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী 'চেঞ্জ উই ক্যান বিলিভ ইন' (আস্থাশীল পরিবর্তন) পেয়েছিল জনগণ? নাকি এটি ছিল শুধুই মিথ্যা আর আপসে ভরপুর এক শাসনামল যেসময়ে জর্জ ডব্লিউ বুশ এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভ্রান্ত পরিকল্পনাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কী কারণে তিনি আমেরিকার সৈন্যদলের তৎকালীন ক্ষমতাসীন জেনারেলের বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যার দরুণ জেনারেল হোয়াইট হাউসের নির্দেশ অমান্য করে কার্যপরিচালনা করেন? এমন আর কী কী আছে যা আমরা জানি না?

# সূচীপত্র

ভূমিকা/১১
দ্য কিলিং অব ওসামা বিন লাদেন/২৫
দ্য রেড লাইন এণ্ড দ্য র‍্যাট লাইন/৬৭
সারিন কার?/৯৩
মিলিটারি থেকে মিলিটারি/১১৫

# ভূমিকা

এই বইয়ে উল্লেখিত সকল তথ্য ও ঘটনাবলীর মূলে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। সেটা হল- ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ, যিনি তাঁর দুর্দান্ত ও আকর্ষণীয় নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে একটি জাতিকে 'আশা' ও 'আস্থাশীল পরিবর্তন' এর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর মানুষ ইতিমধ্যেই জানে যে রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রচারণার সময়েই করা হয়ে থাকে, এর চেয়ে বেশি তার আর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু জর্জ বুশ ও ডিক চেনি'র আট বছর মেয়াদী শাসনামল পার করে, বারাক ওবামা'র সম্বন্ধে 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট' লাইনটি বারবার শোনার পরে মনের মাঝে সত্যিই ক্ষীণ আশা জেগেছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পরে জনতার উদ্দ্যেশ্যে দেওয়া তাঁর প্রথম সম্ভাষণে আইনের নীতি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ঐ আদর্শগুলিই এখনো পথ দেখিয়ে চলেছে আর আমরা শুধুমাত্র কিছু যুক্তি-তর্কের কারণে সেগুলোকে বাতিল করব না।"

কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতির বাইরেও তিনি এমন একজন প্রেসিডেন্ট যিনি ২০১১ সালের মে মাসে ওসামা বিন লাদেন এর হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে গোটা পৃথিবীকে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলেছেন, ভুল তথ্য দিয়েছেন। যার কারণে আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সহযোগী দেশ আজ বিপদাপন্ন হয়েছে এবং দেশটির সাথে মিত্রতাও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। যিনি ২০১৩ সালের আগস্টে সিরিয়াতে বোমা বর্ষণের জন্য সাংসদীয়

অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তা পাওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি তথ্য গোপন করেন, যেখানে স্পষ্টত বলা হয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক আক্রমণে ব্যবহৃত 'নার্ভ এজেন্ট' (স্নায়বিক অসুস্থতা সৃষ্টিকারী রাসায়নিক) এর সাথে সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর সংগ্রহে থাকা রাসায়নিক অস্ত্রের কোনোরকম মিলই নেই; যিনি গোপনীয়ভাবে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীকে, গাদ্দাফি পরবর্তী সময়ের বিশৃঙ্খল লিবিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ার বিদ্রোহীদের সরবরাহ করার জন্য অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট ক্ষেপনাস্ত্র (মিসাইল) সহ অন্যান্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের একটি বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমতি প্রদান করেন। অথচ ঐ বিদ্রোহীদের বেশিরভাগই ইসলামপন্থী ছিল। ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সহযোগী-দেশের গোপন সূত্রে পাওয়া খবরকে অগ্রাহ্য করেন, যেখানে বারবার করে বলা হয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট 'রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান' এর নেতৃত্বাধীন তুরস্ক, সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া 'আল-নুসরা' ও 'আইএস' এর মতো দু'টি চরমপন্থী মিলিশিয়া বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করছে। হোয়াইট হাউজের সঠিক তথ্যের মূল্যায়নে এই ব্যর্থতা ও বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার কারণে, পেন্টাগনে নিয়োজিত যুগ্ম প্রধানেরা ওবামাকে না জানিয়েই, আমেরকিার সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সহযোগী দেশের মাধ্যমে সিরিয়াতে জঙ্গী বিরোধী লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

পররাষ্ট্র বিষয়ে ওবামার বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতা সংক্রান্ত ত্রুটি তাঁর ব্যতিক্রমী নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতিকে আরও বেশি বিভ্রান্তিকর করে তুলেছিল। বর্ণবাদ সংক্রান্ত সমস্যা ও জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা প্রদান থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘ সময় যাবৎ চলতে থাকা সমস্যার সমাধান ও গুয়ান্তানামো'তে অবস্থিত আমেরিকার কুখ্যাত কারাগারটি বন্ধের প্রতিশ্রুতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যেভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা সহজেই মানুষের আস্থা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বলেছিলেন যে তিনি ঠিক শান্তিবাদী নন, তবে সামরিক শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারও সমর্থন করেন না। যুদ্ধ ঘটতে পারে এমন ধরনের 'মানসিকতা' পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন তিনি। অর্থলোভী ও

হঠকারী রাজনীতিবিদদের ভীড়ে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই বিশ্বস্ত আশার আলো, যাঁকে আমেরিকার জনগণ দেশটির সবচেয়ে ভালো প্রেসিডেন্ট মনে করত।

ওবামা একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং ইরানের সাথে পারমানবিক শক্তি বিষয়ে একটি যুগান্তকারী চুক্তি সম্পাদনের জন্য জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ষড়যন্ত্রকারী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। এমন একজন রাজনীতিবিদকে বুঝতে পারা সত্যিই দুরূহ। এটা ভাবাই যায় না যে ওবামার মতো বিচক্ষণ একজন মানুষ বিশ্বজুড়ে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। আর ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্তদের কোনোরকম বিচারকার্য ছাড়াই হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এমনকি সেই সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলে তার ক্ষেত্রেও একই আদেশ প্রযোজ্য ছিল।

৯/১১ এর সন্ত্রাসী আক্রমণের পনের বছর পরে আজ একথা প্রমাণিত যে পররাষ্ট্র নীতির পরিকল্পনায় এবং সন্ত্রাস মোকাবেলায় ওবামা তাঁর পূর্বসূরীদের বেশ কিছু নীতি অনুসরণ করেন; যার মধ্যে গুপ্তহত্যা, ড্রোন দ্বারা আক্রমণ পরিচালনা, বিশেষভাবে গঠিত সেনাদলের ব্যাপক কার্যকারিতা, গুপ্ত অভিযান, আর আফগানিস্তানের যুদ্ধে মার্কিন সামরিক বাহিনীর নির্দিষ্ট সময়ের পরেও কার্যাবলী চালিয়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য। এর সবই বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত যুদ্ধের মূল কারণ। আর বুশ ও চেনি'র শাসনামলের মতো ওবামা'র সময়েও জঙ্গীবাদ মোকাবিলায় বিজয় প্রাপ্তি তো দূরের কথা, কোনোরকম সাফল্যই হাসিল হয়নি। আইএস বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্ধষ শত্রু 'আল-কায়েদা'র স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। সংস্থাটি এখন আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এদিকে রাশিয়া ও ওয়াশিংটন একই ধরনের সন্ত্রাসের শিকার হলেও, ওবামার দৃষ্টিতে রাশিয়া আজও একটি সহযোগী দেশ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বরং এমন একটি শত্রুদেশ হিসেবেই বিবেচ্য যার বিরুদ্ধে (তাঁর মতে) 'সামনাসামনি যুদ্ধ করাই উচিৎ'।

৯/১১ এর আক্রমণের পরে হোয়াইট হাউজে কর্মরত ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিকল্পনার সাথে জড়িত কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আমার একান্তভাবে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। ওবামা'র দায়িত্ব গ্রহণের শুরুর দিকেই আমি জানতে পারি যে তিনি শাসন সংক্রান্ত প্রচলিত মূলনীতির বিরুদ্ধে গিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের দুই দিন পরে ২২ জানুয়ারি ২০০৯ সালে তিনি প্রথম কোনো সরকারি কাজ সম্পাদন করেন। এই সময়েই তিনি ঘোষণা দেন যে তিনি মার্কিন জাতির 'মানবিক নীতিবোধ'কে এর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য গুয়ান্তানামোতে অবস্থিত কারাগারটি 'যতো দ্রুত সম্ভব' বন্ধ করার উদ্দ্যেশ্যে একটি নির্বাহী আদেশ (এক্সিকিউটিভ অর্ডার) জারি করবেন। এই লেখার সময় পর্যন্ত সেই আদেশের বাস্তবায়ন হয়নি এবং মার্কিন জাতির নির্লজ্জতার নিদর্শন স্বরূপ, কোনোরকম বিচার প্রথা বা কৈফিয়ৎ প্রদানের ব্যবস্থার অভাবে এখনো নব্বই জন কয়েদী সেখানে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রচারণায় ওবামা আফগানিস্তানে চলতে থাকা যুদ্ধকে ন্যায়সংগত দাবি করেন এবং সেখানে আরও সৈন্য মোতায়েন করার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন। তাঁর অনেক সহযোগী সদস্যই এই বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করেছিল। আমি শুনেছিলাম যে দায়িত্ব গ্রহণের তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এর এক গোপন বৈঠকে তাঁর সিনিয়র উপদেষ্টাদের বলেছিলেন যেন আফগানিস্তানে নিযুক্ত ৪৭,০০০ সেনার সাথে আরও ১৭,০০০ নতুন সেনা মোতায়েন করা হয়। এটা কোনো দলীয় সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং এটি ছিল ওবামা ও তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল জেমস্ জোন্স- এর একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত।

ওবামা ও জোন্সের মতে আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্তান কেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ ছিল, কারণ একেতো পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তিতে সমর্থ একটি দেশ, তার উপরে দেশটি তালেবান সেনাদের সহযোগিতা করেছিল ও আশ্রয় দিয়েছিল। আর এই তালেবান সেনা সেসময়ে অর্থাৎ আল-কায়েদার কর্মকাণ্ড বন্ধের পরে, আফগানিস্তানে

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। একটি নতুন প্রশাসন হিসেবে সেটি ছিল যথেষ্ট উদ্ধত পদক্ষেপ। আর অন্য সকল নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার মতো এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী পরিকল্পনা ও সেগুলোর পরিণতি তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়া একটি আস্থাভাজন সূত্রের মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে জোন্স একটি সভায় এই পদক্ষেপের পিছনে কারণ দর্শিয়ে বলেছিলেন যে, "আফগানিস্তান আমাদের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা নীতির সাথে সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশ নয়, কিন্তু সেখানে যুদ্ধরত আমাদের সৈনিকদের পরিশ্রম ও ত্যাগকে আমরা পণ্ডশ্রমে পরিণত করতে চাই না। তাই আমরা আফগানিস্তান থেকে আমাদের সৈন্যদলকে সরিয়ে না নিলেও দেশটির পরিস্থিতি যেন আরও খারাপ না হয়ে যায় সেই চেষ্টাই করব।"

ওবামা তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বছরের বেশিরভাগ সময়ই আফগানিস্তান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজে ব্যয় করেন। সিদ্ধান্তটি এই বিষয়ে ছিল না যে দেশটিতে চলতে থাকা যুদ্ধটি আরও বাড়ানো হবে না কি বন্ধ করা হবে, বরং এই বিষয়ে ছিল যে আমেরিকার ইতিহাসের দীর্ঘতম ও সবচেয়ে ব্যর্থ এই যুদ্ধটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য, আরও কতজন অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করা উচিৎ। এই আফগান যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সেনা মোতায়েন নিয়ে যখন আমেরিকার জেনারেলরা ভোটাভুটি শুরু করেছিলেন, তখন কার্যদিবসের বাকি সময় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত গোপন তথ্য ও অভ্যন্তরীণ বিভেদ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকা প্রেসিডেন্ট- এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এক পর্যায়ে, বিশেষ অভিযান পরিচালনা ও আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দলপতি সেনাবাহিনীর জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল এর পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণভাবে পাঠানো অত্যন্ত গোপনীয় একটি আবেদন, হোয়াইট হাউজে পাঠানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়াশিংটন পোস্ট এর হাতে গোপনসূত্রে পৌঁছে যায়। এ ব্যাপারেও ওবামা'র কোনো বাধা বা অনুমোদন ছিল না। ম্যাকক্রিস্টাল তার সেই আবেদনে আরও ৮০,০০০ অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করার অনুমতি চেয়েছিলেন।

ওবামা এক পর্যায়ে প্রথম কিস্তিতে ৩০,০০০ নতুন সেনা মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সিদ্ধান্তটিকে একজন নির্বিকার প্রেসিডেন্ট ও যুদ্ধোন্মত্ত পেন্টাগনের মধ্যকার আপোষ হিসেবেই প্রচার করা হয়েছিল। তবে সংসদের অন্তত একজন সিনিয়র সদস্য যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই সন্দেহ করেছিলেন যে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন সংক্রান্ত ব্যাপারে সেনাবাহিনীর প্রধানদের এরূপ হৈচৈ এর বিরোধিতা করলেও, ওবামা বরাবরই এই সিদ্ধান্তের পক্ষেই ছিলেন।

২০০৯ সালে, উইসকন্সিনের ডেমোক্রেটিক আইনজীবি ডেভিড ওবে ক্ষমতাশালী 'হাউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্স কমিটি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। গোপনভাবে পরিচালিত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অভিযান ও বিভিন্ন তদন্ত কর্মকাণ্ড সহ সকল প্রকার সরকারি কাজের অর্থায়নের ব্যবস্থা করার জন্য যে দুইটি কমিটি নিয়োজিত ছিল তার মধ্যে এই হাউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্স কমিটি ছিল একটি। ১৯৬৯ সালে যখন ভিয়েতনাম-যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ছিল, সেসময়ে ওবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বরবারই স্পষ্টভাষী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। জর্জ বুশ ও ডিক চেনি'কে তাদের জঙ্গী বিরোধী যুদ্ধ পরিকল্পনা সংক্রান্ত আপত্তিকর বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে দু:সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি।

ওবে সহ সংসদের অন্যান্য সদস্যদের কাছে ঐ বিষয়গুলি আপত্তিকর ছিল কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে সংবিধান অনুযায়ী, ঐ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা সংসদ করেনি। ওবে তাঁর এই বিরোধীতামূলক কার্যকলাপে খুব বেশি সফল হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ২০০৫ সালের শুরুর দিকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল রীতিমতো প্রশংসনীয়; যার মধ্যে হাউজ ফ্লোরে দেওয়া তাঁর ছোট্ট ভাষণ ও এর ফলে 'বুশ হোয়াইট হাউজ' এর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদানের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতিকে দ্রুত বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাকে সেসময়ে বলেছিলেন যে নীরবতা ভঙ্গের (যুদ্ধ সংক্রান্ত আপত্তিকর তথ্য জেনেও বাধ্য হয়ে চুপ থাকা) জন্য গোপনে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং 'সংসদ, এর পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে'।

২০১০ সালে তাঁর অবসরের ঘোষণা দিয়ে ওবে তাঁর সহকর্মীদের বেশ চমকে দেন। বুশের শাসনামলে তাঁর সাথে আমার প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হত, তবে তিনি শুনতেন বেশি আর বলতেন কম। সংসদ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায় ছয় মাস পরে তিনি আরও বেশি স্পষ্টভাষী হয়ে ওঠেন। ২০০৯ সালের মার্চে সংসদের আরও কয়েকজন নেতার সাথে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের একটি বৈঠকে যোগদানের কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। বৈঠকের বিষয় ছিল আফগানিস্তান এবং ওবামা তাদের জানিয়েছিলেন যে তিনি দেশটিতে চলতে থাকা যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন সেনা মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

"তিনি (ওবামা) বলেছিলেন যে তাঁকে অনেকেই যুদ্ধটি (আফগান যুদ্ধ) দীর্ঘায়িত করার পরামর্শ দিয়েছে। এরপরে তিনি এই বিষয়ে একে একে আমাদের সকলের মতামত জানতে চান। একমাত্র জো বিডেন (তৎকালীন উপ-প্রেসিডেন্ট) প্রয়োজনীয় বাড়তি খরচের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করেছিলেন। যখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি বলেছিলাম, 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আপনার হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ও কার্যনীতি থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য আপনার যথার্থ মাধ্যমও প্রয়োজন; আর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সরকার সেই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম নয়। আপনি যদি হঠাৎ করেই আফগানিস্তানে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ বাড়াতে চান, তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন যে, স্বদেশের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের একটা বড় অংশ এই খাতে ব্যয় হয়ে যাবে যার ফলে স্বদেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হবে। তবে হয়তো শুধু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।" (পরে এক সময়ে অভ্যন্তরীণভাবে হিসাব করে দেখা গেছে যে যদি আফগান যুদ্ধে আরও ৪০,০০০ অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হত তাহলে পরবর্তী ১০ বছরে সেই খরচের পরিমাণ হত ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সমপরিমাণ।)

সেই বৈঠক শেষ হওয়ার পরে ওবে, প্রেসিডেন্টের সাথে কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলেন। সেসময়ে তিনি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেন যে

দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার ব্যাপারে, আমেরিকার প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বিষয়ে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসনের টেলিফোন সংলাপগুলো তিনি (প্রেসিডেন্ট ওবামা) কখনো শুনেছেন কি না। তাঁর দায়িত্বকালে প্রেসিডেন্ট জনসন ৯,০০০ এরও বেশি সংখ্যক টেলিফোন সংলাপ রেকর্ড করেছিলেন। ২০০৩ সালে ঠিক যে সময়ে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের চলা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছিলেন, সেসময়ে এই রেকর্ড করা সংলাপগুলো জনসাধারণের উদ্দ্যেশ্যে প্রচার করা হয়, যা ওয়াশিংটনে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ওবামা তাঁর উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি রেকর্ডগুলো শুনেছিলেন। ওবে বললেন, "আমি তখন ওবামাকে জিজ্ঞেস করলাম যে রিচার্ড রাসেলের সাথে (জনসনের) সেই কথোপকথনটির কথা মনে আছে কি না, যেখানে তাঁরা (রাসেল ও জনসন) ভিয়েতনামে আমেরিকান সৈন্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কেন ভুল হবে সে বিষয়ে কথা বলেছিলেন। আমার উদ্দ্যেশ্য ছিল তাঁকে (ওবামাকে) এটা বোঝানো যে রিচার্ড ও রাসেল যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার সিদ্ধান্ত নিলেও, তাঁরা একে অন্যকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে সেটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।"

সিনেটর রাসেল ছিলেন জর্জিয়ার একজন বর্ণ-বিদ্বেষী ও মৌলবাদী, 'আর্মড সার্ভিসেস কমিটি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং জনসনের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। ১৯৬৪ সালের মে মাসে জনসন যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধে অনেক বেশি সংখ্যক নতুন সৈন্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেন, তার ঠিক চৌদ্দ মাস আগে এই কথোপকথনটি ঘটেছিল। এটি ছিল প্রেসিডেন্ট জনসনের রেকর্ড করা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং নির্দেশনা পূর্ণ (পরবর্তী প্রেসিডেন্টদের জন্য) কথোপকথন। রাসেল ও জনসন উভয়ই জানতেন যে, ভিয়েতনামে আমেরিকান সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করার মানে হবে চীনের সাথে বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পরা, যার পরিণাম সম্পর্কে তাঁরা কেউই অবগত ছিলেন না। রাসেল বলেছিলেন, "আমি তোমায় বলছি, এটা এই দেশের জন্য সবচেয়ে ব্যয়বহুল (আর্থিক ও অন্যান্যভাবে) অভিযান হবে।" প্রত্যুত্তরে জনসন বলেছিলেন, "সেকথা

মনে করেই আমি শিউরে উঠছি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো সাহস আমার নেই, কিন্তু এর থেকে মুক্তির অন্য কোনো উপায়ও আমি জানি না।"

ওবে এরপর ওবামাকে তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, "আপনার জীবনের 'জর্জ বল' কে?" জর্জ বল ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কেনেডি'র সময়কালে স্বরাষ্ট্র অধিদপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনিই একমাত্র সিনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন যিনি ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই সরকারি দলীয় হয়েও, দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকান সেনার সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে কেনেডির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। তাঁর (কেনেডির) সাথে এই ব্যাপারে বেশ তর্কও করেছিলেন। আর এই কারণেই তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধও ছিলেন। ওবামা এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। "হয় তাঁর জীবনে কোনো 'জর্জ বল' ছিলনা অথবা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই উত্তর দেননি," ওবে আমাকে বললেন। "কিন্তু আমি এমন কাউকে পেলাম না যে প্রেসিডেন্টকে (ওবামা'কে) আফগানিস্তানের যুদ্ধটি বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে।"

আফগানিস্তানে সেনা মোতায়েন বাড়ানোর ব্যাপারে ওবামা'র প্রাথমিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত আমার সাক্ষাৎকারগুলো থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে: সকল প্রকার বিশেষ সেনা অভিযান ও স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টালের প্রতি ওবামা'র ছিল অগাধ বিশ্বাস। স্ট্যানলি ছিলেন আফগানিস্তানে আমেরিকান সেনাদলের অধিপতি এবং তিনি ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত 'জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস্ কমাণ্ড' (জেএসওসি) এর পরিচালক হিসেবে ডিক চেনি'র সাথে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এলিট নেভী সীলস্ ও সেনাবাহিনীর ডেল্টা ফোর্স নিয়ে জেএসওসি সংগঠিত হয়েছিল। ৯/১১ এর পর থেকে আফগানিস্তানে তালেবান ও ইরাকে জিহাদীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত রাত্রিকালীন সফল অভিযানের কারণে এই দলগুলি বিভিন্ন বই ও চলচ্চিত্রে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই জেএসওসি এরই একটি সীল সেনার দল ২০১১ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের ঐ গুপ্ত আস্তানায় বিন লাদেনকে হত্যা করেছিল।

২০০৯ সালে ও তার পরবর্তী সময়কালে তালেবানের বিরুদ্ধে ওবামা'র নতুনভাবে পরিকল্পিত এই রাত্রিকালীন অভিযান পরিচালনায় অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা ও একাগ্রতা নিয়ে কোনোরকম দ্বিমত নেই। কিন্তু সেসময়ে আমি জেনেছিলাম যে, এই এলিট সেনাদলের একটি ভিন্নরূপও রয়েছে। "এই দলে যথেষ্ট দক্ষ ও সাহসী এবং দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন সেনা রয়েছে। আর ব্যক্তিগত উদ্যোগই এই ধরনের অভিযানে জয়ের মূলমন্ত্র," একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা বলেছিলেন, "কিন্তু জেএসওসি'এর ব্যক্তিস্বাধীনতা নীতির কারণে, মাঝে মাঝেই বেশ কয়েকজন সৈনিক তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রদত্ত স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে ছেলেমানুষি আচরণ করে। (তারা মনে করে) 'আমরা স্পেশাল আর সেজন্য আমাদের বেলায় সব নিয়ম খাটে না'। এই কারণেই সাধারণ সেনাবাহিনী সব সময়ই স্পেশাল দলের সৈন্য সংখ্যা সীমিত রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতা যেন ম্যাকক্রিস্টালের দায়িত্ব বহির্ভূত। বরং উল্টো মনে হয় যেন তার সেনাদলকে বরাদ্দকৃত অস্ত্রশস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করাই তার একমাত্র দায়িত্ব।"

৯/১১ এর সময় থেকে যুদ্ধ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী এই প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সেসময়ে বিশেষ অভিযানের উপর ওবামা'র মাত্রাতিরিক্ত আস্থা দেখে বেশ হতাশ হয়েছিলেন। "ওবামা'র উন্নত মানসিকতা ও ডিক চেনি'র নিষ্ঠুরতার মাঝে এতটাই পার্থক্য ছিল যে, যুদ্ধ পরিকল্পনায় বেশ ত্রুটি থেকে গেছে। কেউই জানে না এর পরিণাম কী হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে একটা সময়ে এই যুদ্ধটিকে আফগানী পন্থায় পরিচালিত করতে হবে (ইরাকে যেভাবে করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই, প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আফগান সেনাবাহিনীকেই তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তৈরি করা) এবং এর ফলও তা-ই হবে যেরকমটা দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমাদের সহযোগী সেনাদলের সাথে ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন তালেবান সেনারা দেশটি দখল করে নিবে।"

প্রেসিডেন্ট ও হোয়াইট হাউজের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে ম্যাকক্রিস্টাল ও তার সহযোগিদের করা নেতিবাচক মন্তব্য জনপ্রিয়

ব্যাণ্ডদল 'রোলিং স্টোন' তাদের গানে সরাসরি ব্যবহার করলে, ম্যাকক্রিস্টালকে তার পদ থেকে ২০১০ সালের জুন মাসে বহিষ্কার করা হয়। বিশেষ অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেসিডেন্টের সাথে একটি সম্মুখ সাক্ষাৎকে 'অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন' হিসেবে আখ্যায়িত করে ম্যাকক্রিস্টাল বলেছিল, "(সাক্ষাৎটি ছিল) ১০ মিনিটের একটি ফটোসেশনের চেয়ে সামান্য বেশি কিছুমাত্র"। তার করা বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্যের মধ্যে এটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ততদিনে ঐ যুদ্ধের মূল উদ্দ্যেশ্য অর্থাৎ তালেবানদের খুঁজে বের করে হত্যা করার কাজে ম্যাকক্রিস্টালের আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ে সকলের মনেই বেশ সংশয় দেখা দিয়েছিল।

সে বছরের জুন মাসে রেড ক্রসের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি'র (আইসিআরসি) একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমার সাথে দেখা করতে আসেন। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জেনেভা কনভেনশনের নিয়মনীতির সাথে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কোনো দেশের সাধারণ জনগণ ও বন্দীদের হাল-হকিকতের কতটুকু মিল রয়েছে তা গোপনে পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তার মানবিক অভিযান। জঙ্গীবাদ বিরোধী যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুয়ান্তানামোতে অবস্থিত কারাগার পরিদর্শনের জন্যও আইসিআরসিকে খুব সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে জনসাধারণের কাছে এই কারাগারের বাস্তবতা প্রচার করা যাবে না।

উক্ত কর্মকর্তা আফগানিস্তানের কারাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য আমার কাছে আসেননি। ওবামা প্রশাসনের যুদ্ধ পরিচালনার সামগ্রিক নীতিই ছিল তাঁর প্রধান সমস্যা। স্বরাষ্ট্র অধিদপ্তরের সচিব হিলারি ক্লিনটন সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার উদ্দ্যেশ্যে তিনি ওয়াশিংটনে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট ছিল: ম্যাকক্রিস্টাল ও সেনাবাহিনী ভুল মানুষদের হত্যা করছে। "একমাত্র আমাদের পরিদর্শকেরাই কোনো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে আসা প্রতিনিধি যাদের সাথে তালেবান যোদ্ধারা সভ্য আচরণ করছে, আর তোমরা আমেরিকানরা তাদেরকেই হত্যা করছ যারা

আমাদের কর্মকাণ্ড ও নিয়মনীতি মেনে চলছে," তিনি আমাকে বলেছিলেন। "তোমরা সেসকল তালেবানদের হত্যা করছ যারা চরমপন্থী নয় এবং যারা মরতে চায় না। আর টাইম স্কোয়ারে বোমা বর্ষণের বিষয়ে তাদের কিছুই যায় আসে না। আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের কোনোরকম ক্ষোভ নেই।" তিনি বলেছিলেন, "নির্বিচারে সকল তালেবানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যা করার ব্যাপারটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। আর এর ফলে আরও চরমপন্থী ও উগ্র মতবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।"

এক সময় তিনি বললেন যে আফগান রাজধানী কাবুলে চলতে থাকা যুদ্ধের কোনো এক পর্যায়ে রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ নিয়ে তালেবান নেতাদের মধ্যে তুমুল বাক-বিণ্ডতা হয় যেখানে মধ্যমপন্থীরাই জয়ী হয়। আইসিআরসি এর সেই পরিদর্শক আমায় এটা তো বলেননি যে সেই বাক-বিণ্ডতার সম্পর্কে তাঁর প্রতিষ্ঠান কীভাবে জানতে পেরেছিল, তবে তিনি এটা বলেছিলেন যে "যে সকল মধ্যমপন্থী নেতারা সেই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধীতা করেছিল, আমেরিকানরা (জেএসওসি এর পরিচালক ও কর্মকর্তারা) তাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে (গুপ্তভাবে হত্যা করেছে)। আর এভাবে মধ্যমপন্থী তালেবানদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।"

দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ অভিযান সংশ্লিষ্ট দলে দায়িত্ব পালনকারী একজন পরামর্শদাতা, আফগানিস্তানের যুদ্ধে ঘটতে থাকা বিচারহীন হত্যাকাণ্ডকে 'জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনা নীতির দুর্বলতার লক্ষণ' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন, "এই যুদ্ধের মূলভিত্তি হল যথাযথ রণনীতি। কিন্তু রিপাবলিকান বা ডেমোক্রেট- কোনো দলের সদস্যই কোনো দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে এগোয়নি। বিশেষ সেনাদলের সদস্যরা মুক্তির অপেক্ষায় বন্দী কুকুরের মতো কেবল নির্দেশ মান্য করে যাচ্ছে। তারা যা করছে তার পরিণাম সম্পর্কে একেবারেই ভাবছে না। সেনাবাহিনী ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই যথার্থ নেতৃত্বের অভাবই আমাদের এই করুণ ব্যর্থতার মূল কারণ।"

২০১৪ সালের শেষদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত যৌথবাহিনী এককভাবেই আফগান যুদ্ধের ইতি ঘোষণা করে। আর ঠিক যেরকমটা ভাবা হয়েছিল, দুর্নীতিগ্রস্থ ও হতবুদ্ধি আফগান সামরিক বাহিনীই তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই সামরিক বাহিনীর না আছে যথাযথ নেতৃত্ব, না আছে কোনো সংকল্প বা পরিকল্পনা। কিন্তু এই সামরিক বাহিনীর ভরণপোষণের জন্য প্রতি বছর ওবামা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হচ্ছে। গত বছর ওবামা আবারও আফগানিস্তানে নতুন সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আপাতদৃষ্টিতে উপদেষ্টার ছদ্মবেশে প্রেরিত হলেও, এবারেও যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা হত্যা করছে এবং নিজেরাও মারা পরছে। অথচ বেশিরভাগ আফগানদের কাছেই গণতন্ত্র শব্দটির কোনোই অর্থ বা গুরুত্ব নেই।

২০০৯ এবং ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা যেসকল বিচার-বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে এই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলির কোনোটি থেকেও কি আমেরিকার এই আক্রমণের কারণে নির্দোষ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া গিয়েছিল? উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আফগান সেনাবাহিনীর সামর্থ্য ও সংকল্পহীনতা সম্বন্ধে অজ্ঞাত, প্রেসিডেন্টের সেই উপদেষ্টারা কি আদৌ হোয়াইট হাউজের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী দলের সদস্য হওয়ার যোগ্য? আমেরিকার কোনো সৈন্য কি আফগানিস্তানে দলের শেষ সদস্য হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে চায়?

এখন ওবামার দায়িত্বকালের শেষ সময়ে এসে তাঁর অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা করাটা যে কোনো প্রেসিডেন্টের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ আর এর সঠিক সময়ও এটাই। এটা খুব সহজেই বলা যায় যে এই আলোচনার ফল ভালমন্দ মিলিয়েই হবে। ভালোর মধ্যে একদিকে রয়েছে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নতুন প্রস্তাবনা। আর অন্যদিকে রয়েছে বুশ প্রশাসনের সময়কালে আমেরিকা যে অর্থনৈতিক সংকটে পরেছিল তা থেকে দেশটিকে পুনরুদ্ধার করা। সংসদে ওবামা বরাবরই চরমপন্থী রিপাবলিকান বিরোধী দলের দ্বারা কোণঠাসা হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা যাই হোক না কেন তিনি

এখনও মনে করেন যে আমেরিকানদের মানসিকতা ও রাষ্ট্রনীতি আর দশটা জাতির চেয়ে ভিন্ন। আর তিনি এখনও বিশ্বাস করেন বা বিশ্বাস করার ভাব করেন যে জঙ্গীবাদ বিরোধী যুদ্ধ, যা মূলত একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও মূল আদর্শের বিরুদ্ধে করা যুদ্ধ- এই যুদ্ধে আমেরিকান বোমা বর্ষণ, ড্রোন দ্বারা আক্রমণ ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করার মাধ্যমে জয়লাভ করা সম্ভব। এরকম বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট যুক্তি বা প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

সিমর হার্শ
ওয়াশিংটন, ডিসি
১৫ জানুয়ারি, ২০১৬

দ্য কিলিং অব

# ওসামা বিন লাদেন

আজ থেকে চার বছর আগে ইউএস নেভী সীলস্ এর একটি দল পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরের একটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়িতে গোপনে, রাতের আঁধারে অভিযান চালিয়ে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। এই গুপ্তহত্যাকাণ্ড ছিল ওবামার প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম দফায় দায়িত্ব পালনের সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং এটি তাঁর দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হওয়ার পিছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হোয়াইট হাউজ থেকে এখনও এটাই বলা হয়ে থাকে যে এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা পরিচালিত একটি অভিযান। একথাও বলা হয় যে এই অভিযানের ব্যাপারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের এবং ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) এজেন্সীকেও আগে থেকে কোনো কিছু জানানো হয়নি।

ওবামা'র প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে প্রচারিত অনেক মিথ্যা ও ভুল তথ্যের মধ্যে এটিও একটি মিথ্যা ছিল। হোয়াইট হাউজের এই গল্পটি হয়তো ল্যুইস ক্যারোল লিখেছিলেন: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনী যাকে হন্য হয়ে খুঁজছে, সেই বিন লাদেন কি আসলেই ইসলামাবাদ থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরের একটি পর্যটন-বান্ধব শহরকে তার বসবাস ও আল-কায়েদা'র কার্যপরিচালনার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বলে বিবেচনা করেছিল? সে উন্মুক্ত স্থানেই লুকিয়ে ছিল। অন্তত আমেরিকার ভাষ্যমতে সেটাই সত্যি।

তবে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা এই ছিল যে পাকিস্তানের দুই জন সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় সেনাবাহিনী প্রধান- সামরিক সেনাপ্রধান জেনারেল

আশফাক কিয়ানি ও আইএসআই এর মহাপরিচালক জেনারেল আহমেদ সুজা পাশা- আমেরিকার এই অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ২০১৪ সালের ১৯ মার্চ 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিন'এ প্রকাশিত কার্লোটা গল এর একটি রিপোর্ট সহ অসংখ্য রিপোর্টে গণমাধ্যমের বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও, ঐ অভিযানের ব্যাপারে হোয়াইট হাউজ বরাবরই নিজস্ব অবস্থানে অনড় থেকে এই তথ্যই দিয়েছে। গল ১২ বছর যাবৎ 'টাইমস্' এর প্রতিনিধি হিসেবে আফগানিস্তানে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, একজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা তাঁকে জানায় ঐ অভিযানের পূর্বে পাশা জানতেন যে বিন লাদেন অ্যাবোটাবাদে ছিল। কিন্তু আমেরিকান ও পাকিস্তানি কর্মকর্তারা এই কথা অস্বীকার করে এবং এই বিষয়ে আর কিছু জানা যায়নি।

ইমতিয়াজ গুল তাঁর বই 'পাকিস্তান: বিফোর এণ্ড আফ্টার ওসামা' (২০১২ সালে প্রকাশিত) এ লিখেছেন যে তিনি চারজন গুপ্তচরের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিশ্চিতভাবেই ঐ অভিযান সম্পর্কে অবগত ছিল। এই ধারণাটিই সকলের মনেও ছিল। ইমতিয়াজ গুল ইসলামাবাদে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর রিসার্চ এণ্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ' এর নির্বাহী পরিচালক। নব্বই এর দশকের গোড়ার দিকে আইএসআই এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আসাদ দূররানী'র 'আল জাজিরা'কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে এই বিষয় নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে আবারো বিতর্ক শুরু হয়। দূররানী বলেছিলেন, "এটা হতেই পারে যে আইএসআই এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা বিন লাদেন কোথায় লুকিয়ে আছে তা জানতো না, তবে তারা যে এটা জানতো সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শুধুমাত্র সঠিক সময়েই তার (লাদেন এর) অবস্থান সম্পর্কে (আমেরিকান সেনাবাহিনীকে) জানানোর পরিকল্পনা ছিল। আর সঠিক সময় সেটাই যখন এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময়ের জন্য অপর পক্ষের (আমেরিকার) কাছে যথেষ্ট মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কারণ ওসামা বিন লাদেন এর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ আসামী যখন হাতের মুঠোয় আছে, তখন বিনা

কোনো স্বার্থ আদায় করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়াটা বোকামি হত।"

এই বসন্তে দূররানী'র সাথে যোগাযোগ করে, বিন লাদেন এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমেরিকান বিভিন্ন উৎস থেকে আমি যা জানতে পেরেছিলাম সে সবকিছুই বিশদভাবে জানাই। আমি জানতে পেরেছিলাম যে: বিন লাদেন ২০০৬ সাল থেকেই অ্যাবোটাবাদে আইএসআই এর একজন 'জিম্মি' হিসেবে বন্দী ছিল; কিয়ানি ও পাশা দুইজনেই আমেরিকার সেই অভিযান সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন এবং সীল এর সেনাদের বহনকারী হেলিকপ্টার দু'টি যেন বিনা কোনো বাধায় পাকিস্তানি আকাশপথ পাড়ি দিয়ে অ্যাবোটাবাদে পৌঁছাতে পারে- তাও তাঁরাই নিশ্চিত করেছিলেন; ২০১১ সালের মে মাস থেকে হোয়াইট হাউজের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ক্যুরিয়ার অনুসরণ করে সিআইএ লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেনি, বরং জানতে পেরেছিল একজন উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাছ থেকে যে আমেরিকার ঘোষিত প্রায় ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কারের বিনিময়ে এই গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দেয়। আমি আরও জানতে পেরেছিলাম যে, যদিও এটা সত্যি ওবামার নির্দেশেই সীল এর সেই দলটি ঐ অভিযানটি পরিচালনা করেছিল, কিন্তু ওবামার প্রশাসনের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যান্য অনেক তথ্যই মিথ্যা ছিল।

"যদি আপনি নিজে যে সত্য জানতে পেরেছেন তা আদৌ প্রকাশ করেন, তাহলে পাকিস্তানের জনগণ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে," দূররানী আমাকে বলেছিলেন। "দীর্ঘদিন যাবৎ বিন লাদেন সম্পর্কে সরকারিভাবে প্রকাশিত কোনো তথ্যই জনগণের কাছে আর বিশ্বাসযোগ্য হয় না। (এটা প্রকাশিত হলে) নিশ্চিভাবেই কিছু রাজনৈতিক নেতিবাচক মন্তব্য আসবে এবং অনেকের রাগেরও কারণ হবে। কিন্তু জনগণ সত্য জানতে চায়। আর আপনি আমায় যা যা বললেন, এই ঘটনার পর থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য অনুসন্ধানকারী কয়েকজন প্রাক্তন সহকর্মীর কাছ থেকেও আমি একই তথ্য জানতে পেরেছি।" আইএসআই এর প্রাক্তন প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আমাকে বলেন যে ঐ অভিযানের কিছু সময় পরেই "এই বিষয়ে অবগত ও 'পরিকল্পনাকারী দলে' নিযুক্ত

কয়েকজন মানুষ" তাঁকে জানায়, একজন গুপ্তচর আমেরিকাকে বিন লাদেন এর অ্যাবোটাবাদে অবস্থান করা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিল। আর বিন লাদেনকে হত্যার পরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে কিয়ানি ও পাশা'র (এই ব্যাপারে ভূমিকা পালনের) গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

এই সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল তথ্য প্রদানকারী ছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা যে অ্যাবোটাবাদে বিন লাদেনের অবস্থান সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য জানত। ঐ অভিযানের জন্য সীল সেনাদলকে গোপনীয়ভাবে দেওয়া বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং অভিযান শেষে প্রকাশিত বেশ কিছু গোপন প্রতিবেদন সম্পর্কেও সে জানত। 'স্পেশাল অপারেশন্স কমাণ্ড'এ দীর্ঘদিন যাবৎ পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী দুইজন ব্যক্তিও এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে তথ্য প্রদান করেছিল। পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে আমি এটাও জানতে পারি যে, বিন লাদেনকে হত্যার খবরটি তৎক্ষণাৎ গণমাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত ওবামা'র সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও আইএসআই এর শীর্ষস্থানীয় সেনাদের মধ্যকার মতপার্থক্যের কথাও বেশ শোনা গেছে। দূররানীও এই বিষয়ে একই কথা জানিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে জানতে চাইলে, হোয়াইট হাউজ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

এসব শুরু হয়েছিল ইসলামাবাদে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ভবনের সিআইএ দপ্তরে একজন মানুষের হঠাৎ প্রবেশ করা থেকেই। ২০১০ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার একজন সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উক্ত সিআইএ দপ্তরের দাপ্তরিক প্রধান জনাথন ব্যাংক এর সাথে দেখা করতে আসে। সে সিআইএ কে জানায় যে ২০০১ সালে ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের বিনিময়ে সে বিন লাদেনের তৎকালীন অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে চায়। এই ধরনের প্রবেশকারী ব্যক্তিরা সিআইএ'র নিকট আস্থাশীল তথ্যের যোগানদাতা হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই এক্ষেত্রে সংস্থাটির সদর দপ্তর থেকে একটি পলিগ্রাফিক পরীক্ষা পরিচালনাকারী দলকে ইসলামাবাদে পাঠানো হয়। হঠাৎ প্রবেশকারী সেই ব্যক্তি সিআইএ'র পলিগ্রাফিক পরীক্ষা পাস করে যায়। "এখন আমরা প্রাথমিকভাবে জানি যে বিন লাদেন অ্যাবোটাবাদে একটি বাড়িতে বাস

করছে। কিন্তু আমরা কী করে প্রমাণ করতে পারব যে সে আসলে কে?" সেসময়ে সিআইএ এই বিষয়েই উদ্বিগ্ন ছিল। উক্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমাকে একথাই জানায়।

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানিদের কাছ থেকে পাওয়া সকল তথ্য গোপন রেখেছিল। "তারা (সিআইএ) ধারণা করেছিল যে যদি তথ্য প্রদানকারীর ব্যাপারে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তানিরা নিজেরাই বিন লাদেনকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবে। তাই জনাকয়েক বিশ্বস্ত মানুষকেই উক্ত তথ্য ও এর প্রদানকারী সম্পর্কে জানতে দেওয়া হয়," অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন। "সিআইএ'র প্রথম লক্ষ্য ছিল তথ্যের সত্যতা যাচাই করা।"

ঐ বাড়িটিকে (যেখানে বিন লাদেন ঐ সময়ে বাস করছিল) স্যাটেলাইট সার্ভেইল্যান্স এর মাধ্যমে নজরদারির আওতায় আনা হয়। সিআইএ সামনাসামনি নজর রাখার জন্য অ্যাবোটাবাদে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও বিদেশিদের থাকার ব্যবস্থা করে এবং বাড়িটিকে সিআইএ'র একটি কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। পরবর্তীতে এই কার্যালয়টিই আইএসআই এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। অ্যাবোটাবাদ একটি পর্যটন কেন্দ্রিক শহর হওয়ায় এখানে ছুটি কাটাতে আসা মানুষেরা প্রায়ই অল্প সময়ের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে বলে এই বাড়িটিকে নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথা ছিল না। তথ্য প্রদানকারীর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা সংক্রান্ত একটি প্রোফাইল তৈরি করা হয়। (তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি ও তার পরিবারকে গোপনে পাকিস্তান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল এবং ওয়াশিংটনে তাদের নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বর্তমানে সিআইএ'র একজন পরামর্শদাতা হিসেবে কমর্রত আছেন।)

"অক্টোবর মাসে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা মিলে সেনা অভিযানের জন্য সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। আমরা কি ঐ বাড়িটিতে (বিন লাদেনের তৎকালীন বাসস্থান) সরাসরি বোমা বর্ষণ করব, নাকি ড্রোন দ্বারা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করব? নাকি একজন গুপ্তহত্যাকারী পাঠাবো? কিন্তু সেক্ষেত্রে মৃত্যু ব্যক্তির সঠিক পরিচয়

দেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে থাকত না," অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন। "আমরা একজন মানুষকে রাতের বেলায় হেঁটে বেড়াতে দেখতাম, কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে কোনো রকম যোগাযোগের সাড়া না পাওয়ায় এ ব্যাপারে কোনোকিছুই নিশ্চিতভাবে বোঝা যেত না।" অক্টোবর মাসেই ওবামাকে এই তথ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে জানানো হয়। তিনি এতে বেশ সতর্ক হয়ে পরেন, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে জানান। "এটা একেবারেই মানা যায় না যে বিন লাদেন অ্যাবোটাবাদে বাস করছে। এটা রীতিমতো পাগলামি। তিনি বেশ জোরের সাথেই আদেশ দিয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেনা যে ঐ ব্যক্তি আসলেই বিন লাদেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারে আমি আর কিছুই শুনতে চাই না।"

"সেই মুহূর্তে সিআইএ'র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন্স কমাণ্ড এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ওবামা'র সমর্থন আদায় করা। তারা বিশ্বাস করত যে একটা ডিএনএ রিপোর্টের মাধ্যমে এবং একটা রাত্রিকালীন অভিযান যে বিপজ্জনক হবে না এটা উনাকে (ওবামাকে) আশ্বস্ত করানোর মাধ্যমে সেই সমর্থন আদায় করা সম্ভব। এই দুইটি কাজ সম্পাদনের জন্য একটাই উপায় ছিল আর তা হল পাকিস্তানিদের দলে টানা," অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন।

২০১০ সালের হেমন্তকালেও যুক্তরাষ্ট্র ঐ তথ্য প্রদানকারী সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রেখেই চলছিল। অন্যদিকে কিয়ানি ও পাশা আমেরিকানদের কাছে একথাই বলে যাচ্ছিল যে লাদেনের তৎকালীন অবস্থান সম্পর্কে তাদের কাছে কোনোরূপ তথ্য নেই। সুতরাং পরবর্তী কাজ ছিল কিয়ানি ও পাশা'কে দিয়ে সত্য কথা স্বীকার করানো এবং সেই সাথে তাদের এটাও জানানো যে অ্যাবোটাবাদের ঐ বাড়িটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্য আছে। আর তাদের এটাও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তারা কিছু জানে কি না। ঐ বাড়িটি অস্ত্র দ্বারা ঘেরা ছিল না, আইএসআই এর অধীনে থাকায় সেখানে কোনো মেশিনগান চোখে পরেনি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানালেন।

তথ্যপ্রদানকারী ঐ ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে জানায় যে বিন লাদেন তার কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত হিন্দুকুশ পর্বতমালায় অজ্ঞাতরূপে বাস করছিল। "আর আইএসআই স্থানীয় আদিবাসীকে তথ্য ফাঁস করতে রাজি করানোর মাধ্যমে তাকে (লাদেনকে) গ্রেপ্তার করতে পারে।" (ঐ গ্রেপ্তার অভিযানের পরে প্রাথমিকভাবে তাকে পাকিস্তানের অন্য কোনো এক স্থানে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে।) তথ্যপ্রদানকারী ব্যক্তি ব্যাংক'কে একথাও জানিয়েছিল যে লাদেন সেসময়ে খুব অসুস্থ থাকায় আইএসআই তাকে (লাদেনকে) চিকিৎসা প্রদানের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর ও একজন ডাক্তার, আমির আজিজ'কে অ্যাবোটাবাদের ঐ বাড়ির কাছাকাছি কোথাও থাকার আদেশ দেয়। "বস্তুত বিন লাদেন সেসময়ে বিকলাঙ্গ হয়ে পরে, কিন্তু এই সত্য কথাটা প্রকাশ করার উপায় ছিল না," অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন। কারণ তখন প্রশ্ন উঠত, 'তুমি বলতে চাইছ যে তোমরা একজন প্রতিবন্ধীকে গুলি করে হত্যা করেছিলে? তার হয়ে তার একে-৪৭ টি কে চালনা করত?'

"পাকিস্তানিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আদায় করে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি কারণ পাকিস্তানিরাও অমেরিকানদের থেকে মিলিটারি সংক্রান্ত সাহায্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাচ্ছিল, যার মধ্যে বেশির ভাগটাই ছিল জঙ্গীবাদ বিরোধী অর্থায়ন যা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য করা হত- যেমন বুলেটপ্রুফ লিম্যুজিন, নিরাপত্তা রক্ষী ও আইএসআই এর শীর্ষস্থানীয় সদস্যদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা," অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানালেন। তিনি আরও বলেন যে এগুলো ছাড়াও গোপনভাবেও বেশ কিছু ব্যক্তিগত 'পুরস্কার' দেওয়া হয়েছিল, যেগুলোর অর্থায়ন হয়েছিল পেন্টাগনের গোপন বিকল্প কোষাগার থেকে। "গোয়েন্দা সংস্থাটি (সিআইএ) ভালভাবেই জানতো যে কী করলে পাকিস্তানিরা সাহায্য করতে রাজি হবে, তাই তারা সে ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। আর পাকিস্তানিরাও তা গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ব্যাপারটা উভয়পক্ষের জন্যই লাভজনক ছিল। তাছাড়া আমরা কিছুটা 'ব্ল্যাকমেইল' এর মাধ্যমেও কাজ আদায় করেছিলাম। আমরা তাদের বলেছিলাম যে

তারা সহযোগিতা না করলে, লাদেন তাদের এলাকাতেই আছে এই তথ্য আমরা ফাঁস করে দিব। আমরা তাদের বন্ধু ও শত্রু উভয়কেই চিনতাম; পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে অবস্থানরত অনেক জিহাদী গোষ্ঠী বিন লাদেনের উপস্থিতির ব্যাপারটি মোটেও ভাল চোখে দেখত না।"

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে শুরুর দিকের এই সময়টাতে সৌদি আরবকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পরতে হয়েছিল, কারণ সৌদি আরব পাকিস্তানের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে বিন লাদেনের দেখাশোনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিচ্ছিল। "সৌদিরা চাইছিলনা যে বিন লাদেন এর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানানো হোক, কারণ সে (বিন লাদেন) একজন সৌদি নাগরিক ছিল। তাই সৌদিরা বিন লাদেনকে এসব ঝামেলা থেকে দূরে রাখার জন্য পাকিস্তানিদের নির্দেশ দিয়েছিল। কারণ তারা (সৌদিরা) ভয় পাচ্ছিল যে আমরা যদি লাদেনের অবস্থানের কথা জানার পরে তার সাথে কথা বলতে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানিদের চাপ দেই, তাহলে বিন লাদেন আল-কায়েদা'র সাথে সৌদি আরবের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমাদের সব বলে দিত। তাই তারা পাকিস্তানিদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা পাঠাচ্ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানিরা ভয় পাচ্ছিল যে সৌদিরা হয়তো বিন লাদেনের উপর তাদের (পাকিস্তানিদের) কর্তৃত্বের বিষয়টি ফাঁস করে দিত। ভয়টা এই ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র যদি বিন লাদেনের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে রিয়াদ (সৌদি আরবের রাজধানী) থেকে জানতে পারত, তাহলে পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভীষণ ভয়ংকর হয়ে উঠত। তাই হঠাৎ করে প্রবেশ করা একজন তথ্য প্রদানকারীর মাধ্যমে বিন লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে আমেরিকানদের অবগত হওয়ার ব্যাপারটা পাকিস্তানের জন্য ততটাও খারাপ ছিলনা।"

জনসমক্ষে বরাবরই বিবাদে জড়িত হলেও, আমেরিকান এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা বেশ কয়েক দশক যাবৎ দক্ষিণ এশিয়ার জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে একসাথে মিলে লড়াই করেছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, জনসমক্ষে বিবাদে জড়ানো উভয় দলের ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার কাজ করছে। কিন্তু তারা নিয়মিতভাবেই ড্রোন আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান ও গোপন অভিযানে একে

অন্যকে সহযোগিতা করে আসছে। সেই সাথে ওয়াশিংটনও এটা বুঝতে পেরেছিল যে, আইএসআই এর সদস্যরা মনে করে যে আফগানিস্তানে অবস্থানরত তালেবানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাটা পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য জরুরি। কাবুলে ভারতীয় প্রভাব নিয়ন্ত্রণে রাখাই আইএসআই এর পরিকল্পনা ছিল। কাশ্মীর সংক্রান্ত বিবাদ মোকাবিলায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য, জিহাদীদের একটি নেতৃস্থানীয় আক্রমণকারী দল হিসেবে পাকিস্তানেও তালেবানরা অবস্থান করত।

সেই সাথে আরও একটি দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল যে পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তিতে সমর্থ একটি দেশ। এই পারমাণবিক শক্তিকে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে প্রায়ই 'ইসলামিক বোমা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় যে ইসরাইলের সাথে কোনোরকম সমস্যার সৃষ্টি হলে পাকিস্তান এই বোমা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো যুদ্ধরত দেশে পাঠাতে পারে। ১৯৭০ এর দশকে যখন পাকিস্তান প্রথম এর পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণকাজ শুরু করে, তখন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টিকে ততটা আমলে না নিয়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করেছিল। আর এখন এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে বর্তমানে পাকিস্তানে শ'খানেকের উপরে পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র মজুদ আছে। ওয়াশিংটন এটা ভালভাবেই বুঝতে পারে যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাটা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য জরুরি। অন্যদিকে পাকিস্তানও একই নীতিতে বিশ্বাসী।

"পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা একে অপরকে নিজেদের পরিবারের মতো মনে করে," অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন। "কর্মকর্তারা সৈনিকদের 'পুত্র' বলে সম্বোধন করে আর সকল কর্মকর্তারা একে অন্যের 'ভাই'। আমেরিকান সামরিক বাহিনীর চিত্রটা ভিন্ন। পাকিস্তানি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মনে করে যে তারা তাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় নাগরিক, আর তাই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ধারক ও বাহক হিসেবে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব। পাকিস্তানিরা এটাও জানে যে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে

নিজেদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। তারা কখনই আমাদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন করবে না।"

সিআইএ'র অন্যান্য শাখার দাপ্তরিক প্রধানদের মতো ব্যাংকও গুপ্ত পরিচয় নিয়েই ইসলামাবাদে দায়িত্বরত ছিলেন। কিন্তু ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে করিম খান নামে একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক ব্যাংকের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করলে, সিআইএ'র শাখার দাপ্তরিক প্রধান হিসেবে ব্যাংকের সেই দায়িত্বের ইতি ঘটে। স্থানীয় সংবাদে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত একটি ড্রোন আক্রমণে করিম খানের ছেলে ও ভাই নিহত হয়। এই হত্যা মামলায় ব্যাংক এর নাম প্রকাশ করার মাধ্যমে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কূটনৈতিক নীতি ভঙ্গ করে এবং এর ফলে বেশ খানিকটা অনাকাঙ্খিত প্রচারণার অবতারণা হয়। সিআইএ ব্যাংককে পাকিস্তান ত্যাগ করার আদেশ দেয়। এই আদেশের প্রেক্ষিতে সংস্থাটির কর্মকর্তারা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'কে জানায় যে নিরাপত্তাজনিত কারণে ব্যাংককে বদলি করা হয়েছে।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল যে ব্যাংক এর নাম, খান এর কাছে প্রকাশিত করার পেছনে আইএসআই এর ভূমিকা রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছিল যে ঠিক এক মাস আগে নিউ ইয়র্কের একটি মামলায় ২০০৮ সালে মুম্বাই এর জঙ্গী হামলার সাথে জড়িত আইএসআই এর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ করার খেসারত হিসেবেই ব্যাংককে বহিষ্কৃত করানো হয়। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাটির ভাষ্যমতে, ব্যাংককে আমেরিকা ফেরত পাঠানোর পিছনে সিআইএ'র আরও একটি উদ্দ্যেশ্য ছিল। বিন লাদেনকে সরিয়ে দেওয়ার কাজে আমেরিকানদের সহযোগিতা করার বিষয়টি প্রকাশিত হলে, পাকিস্তানিদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য একটা অযুহাতের প্রয়োজন পরত। ব্যাংককে সরানোর ফলে পাকিস্তানিরা বলতে পারত: 'তোমরা আমাদেরকে অভিযোগ করছ? আমরাই তো তোমাদের শাখার দাপ্তরিক প্রধানকে বহিষ্কার করলাম।'

বিন লাদেনের তৎকালীন বাসস্থান থেকে পাকিস্তানি মিলিটারি একাডেমির দূরত্ব ছিল দুই মাইলেরও কম। আর পাকিস্তানি সামরিক

বাহিনীর কমব্যাট ব্যাটালিয়ন এর সদর দপ্তর ছিল সেখান থেকে আরও মাইলখানেক দূরে। হেলিকপ্টারে মাত্র ১৫ মিনিটেই 'তারবেলা গাজী' থেকে অ্যাবোটাবাদ পৌঁছানো যায়। তারবেলা গাজী, আইএসআই এর গোপন অভিযান পরিচালনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়। আর এখানেই পাকিস্তানের পারিমাণবিক অস্ত্রাগার প্রতিরক্ষাকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন, "গাজী'র নিকটে থাকলে বিন লাদেনকে সব সময় চোখে চোখে রাখা যাবে বলেই আইএসআই অ্যাবোটাবাদে তার থাকার ব্যবস্থা করেছিল।"

অভিযান পরিকল্পনার এই প্রারম্ভিক সময়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ওবামার জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, আর এর পিছনে বিশেষ কারণ ছিল পূর্ববর্তী একটি দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটি ছিল ১৯৮০ সালে তেহরান থেকে আমেরিকান জিম্মিদের মুক্ত করে দেশে ফেরত নিয়ে আসার ব্যর্থ অভিযান। এই ব্যর্থতার কারণেই জিমি কার্টার নির্বাচনে, রোন্যাল্ড রিগ্যান এর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। "বিন লাদেন কি আসলেই কখনও সেখানে ছিল? গোটা ব্যাপারটাই কি পাকিস্তানিদের একটি ধোঁকা হতে পারে? এই অভিযানে ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার কী ধরনের প্রভাব পরতে পারে?" অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাটির ভাষ্যমতে, "যদি অভিযানটি কোনো কারণে ব্যর্থ হত তাহলে ওবামা'র পরিণতিও জিমি কার্টারের মতো হত, আর দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকত না।"

যুক্তরাষ্ট্র সঠিক অপরাধীকেই গ্রেপ্তার করছে কি না এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া নিয়ে ওবামা বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আর এই নিশ্চিতকরণের উপায় ছিল বিন লাদেন এর ডিএনএ রিপোর্ট। পরিকল্পনাকারীরা কিয়ানি ও পাশা'র নিকট সাহায্য চায় যেন তারা (কায়্যানি ও পাশা), আজিজ কে ডিএনএ রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করতে বলে। অভিযানের কিছু সময় পরেই গণমাধ্যম জানতে পারে যে আজিজ, বিন লাদেনের ঐ বাড়ির কাছেই একটি বাড়িতে বাস করছিল। স্থানীয় সাংবাদিকেরা বাড়ির দরজায় উর্দুতে লেখা তার (আজিজের) নাম সম্বলিত একটি ফলক খুঁজে পায়। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বিন লাদেনের সাথে আজিজের কোনোরকম সম্পর্কই স্বীকার করেনি। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত